কিছু কথা, কিছু প্রশ্ন

অনন্ত

ananta_atheist@yahoo.com

২২-০১-০৬

----

(১)

ছোটবেলায় পাঠ্যবই থেকে পড়তাম বা পড়ানো হয়েছে, সততা সর্বোতকৃস্ট পন্থা, সদা সত্য কথা বলিবে, চরিত্র মানব জীবনের মুকুটস্বরূপ ইত্যাদি। স্কুলের স্যার, টিচাররা আমাদেরকে এই বাক্যগুলি আত্মোস্থ করানোর জন্য কতই না শ্রম, সময় নিবেদন করেছেন। পরীক্ষার প্রশ্নে এই সকল বাক্যগুলিকে ট্রান্সলেশন করতে দিয়ে কিংবা কম্প্রিহেনশনের মধ্য দিয়ে আমাদের মস্তিষ্কে ঢুকিয়ে দিতে চেয়েছেন। এখন মনে হয়, উনাদের ঐকান্তিক চেষ্টায় তখন কোনো ঘাটতি ছিল না। কিন্তু আমি কি এই সকল বাক্যগুলিকে আমার জীবনের চলার পথে প্রয়োগ করতে পেরেছি? উপরোক্ত বাক্যগুলির কথা এখন মাঝে মাঝে মনে পড়লে আমার মধ্যে হাস্যরসের সৃষ্টি হয়। মনে হয়, সব বোগাস! বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের ক্লাসের একজন শিক্ষক বলেন, '*চরিত্র হচ্ছে সুযোগের অভাব। যেখানে দুর্নীতির সুযোগ নেই, সেখানে চরিত্র থাকে কিন্তু যেখানে সুযোগ আছে কুকর্মের, সেখানে চরিত্র ধরে রাখা যাবে না।*' স্যারের বক্তব্য আমার কাছে কাঠকোট্টা সত্য বলে মনে হয়। এই বাঙলাদেশে কি একজন সৎ ব্যক্তি আছে? শুধু এই বাঙলাদেশ না, ধরি এই পৃথিবীতেও। আছে কি একজন সৎ ব্যক্তি, যে কখনো মিথ্যে বলে না? আমার উত্তর হচ্ছে, আমি এখনো পর্যন্ত এরকম একজনও ব্যক্তির খোঁজ পাই নি। কেউ কি দাবি করতে পারবে ? আমি নিজেও সৎ না, মিথ্যে বলেছি প্রচুর, প্রচুর। সব মিলিয়ে সত্য কথা বলা থেকে মিথ্যে বলেছি অনেক, অ-নে-ক বেশি। বাড়িয়ে বলেছি, রং লাগিয়েছি বলার সময়। কিন্তু এমন কেন হল? কেন আমি বা আমরা সবসময় সত্য কথা বলতে পারি না, সৎ থাকতে পারি না? সম্ভব না, এই দুনিয়াতে সৎ থাকা, মিথ্যে না বলে বাঁচা যাবে না। আমাদের এই দুনিয়াতে বেঁচে থাকতে হলে পরিবেশ পরিস্থিতিসহ পারিপার্শ্বিক অনেক কিছুর সাথে সংগ্রাম করে টিকে থাকতে হয়। স্বার্থ আদায় করে নিতে হয় নানা কৌশলে, নানা রূপে। কখনো সেটা স্নেহ, মায়া-মমতা, ভালবাসার ভেকধরে আবার কখনো চোখ রাঙিয়ে। নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে প্রয়োজন যেনতেন উপায়ে স্বার্থ আদায় করে নেয়া। আমরা প্রত্যেকেই চাই উন্নয়ন হোক বর্তমান অবস্থা থেকে। চাহিদার শেষ নাই। আরো আ-রো-ও দরকার আমাদের। তাহলে একটা প্রশ্ন মাথায় আসে, আমরা যদি জানি, বুঝি, সৎ থেকে এই দুনিয়াতে টিকে থাকা যাবে না, সবসময় সত্য কথা বললে সমাজ-সংসার থেকে বিচ্যুত হয়ে যাব; তাহলে কি দরকার পাঠ্যবইয়ে 'সততা, সত্যবাদীতা'-শব্দগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে রাখার? এর থেকে ভালো নয় কি, আমাদেরকে ছোটবেলা থেকেই শিক্ষা দেয়া হোক, কি করে মিথ্যে বলতে হয়, কি করে স্বার্থ আদায় করে নিতে হবে ছলে বলে কৌশলে? তাহলেইতো আমরা আরোও বেশি

করে উন্নতি ঘটাতে পারব নিজেদের। জীবন চলার পথে লব্ধ শিক্ষার প্রয়োগ ঘটাতে পারবো। কি বলেন আপনারা?

(২)

বাঙলাদেশের অবস্থা দিন দিন রসাতলে যাচ্ছে। আমি জানি, আমার বক্তব্যের সাথে অনেকেই একমত হবেন না। অনেকেই দেশের অবস্থা নিয়ে সত্য কথা শুনতে চান না। কোথাও দেশের অধঃপতনের খবর শুনলেই, বিদেশীদের চর বানিয়ে দেন। সেটা 'র', 'সি আই এ', 'কেজিবি'ই হোক। তাছাড়া বাজারে নতুন একটা শব্দ প্রচলিত হয়েছে, 'ভাবমূর্তি'। এই সরকারের আমলে এই শব্দটি এতোবার শুনেছি যে, 'ভাবমূর্তিটি শব্দটির ভ-া-ব ই নষ্ট হয়ে গেছে। আগের সরকারের আমলে শুনেছিলাম 'মৌলবাদ'। যা বলছিলাম, আমাদের অবস্থা এমন হচ্ছে যে দুঃসহ অবস্থার ভাবপ্রকাশের উপযুক্ত শব্দ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। বাংলাদেশের জন্য ফ্রাংকেস্টাইন হয়ে দাড়ানো 'ইসলামী মৌলবাদ' নিয়ে কথা হচ্ছে সবদিকে। খুবই ভালো কথা! কিন্তু এই আলোচনার গোড়ায় যে গলদ রয়ে গেছে। আমাদের শাষকগোষ্ঠী, এদের তাবেদার প্রচারমাধ্যমগুলি, তথাকথিত বুদ্ধিজীবি ('বুদ্ধিফেরিওয়ালা' বলাই ভালো) থেকে শুরু করে সব্বাই একই ধরনের কথা বলতেছেন; ইসলাম ভালো, মৌলবাদ খারাপ (এখানে সব উপাসনাধর্মবাদীদের বক্তব্য একই!)। উনাদের বক্তব্যের ধরন হচ্ছে, 'ইসলামকে কোলে নিয়ে, মৌলবাদকে ঝেটিয়ে বিদায় করো।' হাস্যকর যত কথাবার্তা! একটা যে আরেকটার ভিতর থেকে বের হয়ে আসে, মৌলবাদ যে উপাসনাধর্ম থেকেই উৎপন্ন হয়, সেটা কি উনারা বোঝেন না। নিশ্চয়ই বোঝেন। কিন্তু উনারা কেন সাহস করে সত্যি কথা বলেন না? তাহলে যে আমজনতার মাথায় আর কাঠাল ভেঙ্গে খাওয়া যাবে না আর। আহা! ক্ষমতার দুধ, ঘি, মধু খাওয়ার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করার জন্যে এদেশের বিরাট সংখ্যক জনগোষ্ঠীকে অজ্ঞ, নিরক্ষর, কুসংস্কারচ্ছন্ন রাখাই যে উত্তম। এটা উনারা ভালোই বোঝেন। আমাদের দেশের 'বুদ্ধিফেরিওয়ালাদের' চরিত্র বড়োই বিচিত্র! আচ্ছা, বুদ্ধিজীবিদের কাজ কি? সাদাকে সাদা বলা আর কালোকে কালো বলা, না সবলকে দুর্বল আর দুর্বলকে সবল হিসেবে দেখানো, না সময়মতো জার্সি পাল্টিয়ে চাপা মেরে মেপে মেপে কথা বলা। আমি জানি না। আমার পরিচিত একজন ভদ্রলোক, উনাকে বড়ভাই-এর মতোই দেখি, শিহাবভাই। উনার সাথে গল্পগুজবের মাধ্যমে নানা বিষয় নিয়েই আলাপ হয়। ঐ দিন কি একটা বিষয় নিয়ে আলোচনার সময় বললেন, '*দেখ অনন্ত, এই পৃথিবীতে সমাজ-সংস্কৃতির সাথে জড়িত কোন কিছুতে শত ভাগ সত্য বলে কিছু নাই। সবকিছুতেই বহুমাত্রিকতা আছে, বলা যায় ভালো-মন্দ। আমাদের বুদ্ধিজীবিরা এটা ভালো করেই জানেন, বোঝেন। তুমি একটু পড়াশোনা করলেই দেখবা, যে কোন বিষয়কে ইচ্ছেমতো রং পাল্টিয়ে ভালো-খারাপ বানাতে পারছ। বুদ্ধি খাটাতে জ্ঞান লাগে। যেটা আমাদের বুদ্ধিজীবিদের ভালো পরিমানেই আছে। তাই উনারা নিজেদের আখের গোছানোর জন্যে যখন যেমন প্রয়োজন, মূল বিষয় চেপে গিয়ে সেখানে তেমন বক্তব্য ছাপছেন, তাবেদার প্রচারমাধ্যমগুলোর মাধ্যমে শাষকগোষ্ঠীর বাহবা কুড়াচ্ছেন*'। আমাদের বুদ্ধিজীবিরা রাজনৈতিক ভাবে বিভক্ত। কেউ আওয়ামীলীগ পন্থী, কেউ বি এন পি পন্থী, কেউ বামপন্থী আবার কেউবা জামাতপন্থী। কিন্তু কেউই এই দেশের অসহায়, অজ্ঞ, নিরক্ষর মানুষগুলোর

পক্ষে নয়। আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর সবাই শাষক হতে চায়, সেবক নয়। আর এই সকল ক্ষমতাপাগল রাজনৈতিকদলগুলোকে দিবানিশি তেল দিয়ে চলছেন বহুধা বিভক্ত বুদ্ধিফেরিওয়ালারা। 'ইসলামী মৌলবাদ' নিয়ে হট্টগোলের এই সময়ে দুই শ্রেনীর বুদ্ধিজীবিরা (আওয়ামীপন্থী এবং বামপন্থী) জামাতে ইসলামী নামক রাজনৈতিক দলকে দোষে চলছেন। কেউ কেউ অবশ্য বিএনপি কেও অভিযুক্ত করছেন। বি এন পি'র কাধে সওয়ার হয়ে জামাতে ইসলামী এই দেশে ইসলামী মৌলবাদকে বিকশিত করেছে। এই সকল বুদ্ধিজীবিদের বক্তব্য শুনলে মনে হয়, জামাত ইসলামী, বি এন পি এবং সেইসাথে ইসলামী ঐক্যজোট সহ কয়েকটা ইসলামী দলগুলো-ই এই দেশে মৌলবাদ বিকশিত হওয়ার জন্য একমাত্র দায়ী। আহ!! আওয়ামীলীগ ধুয়ো তুলিসিপাতা। আর বামপন্থীরা এখন পর্যন্ত ক্ষমতার চৌহিদ্দির ভিতরেই আসতে পারেনি! আওয়ামীলীগ আমলে কবি শামসুর রাহমান হত্যাচেষ্টা থেকে শুরু করে উদিচীর অনুষ্ঠানে বোমা হামলা, রমনার বটমূলে বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে বোমা হামলা, কাদিয়ানীদের মসজিদে হামলা, বানিয়াচং-এর গির্জায় বোমা হামলা, বাঙলাদেশ কমিউনষ্ট পার্টির জনসভায় বোমা হামলা, নারায়ণগঞ্জে আওয়ামীলীগ কার্যালয়ে বোমা বিস্ফোরণ সহ অন্যান্য স্থানে সংঘটিত অপরাধের ব্যাপারে এখন আওয়ামী-বাম ধারায় উজ্জীবিত বুদ্ধিজীবিরা চুপ কেন? তৎকালীন সরকার এই সকল হামলাকারীদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নিতে পেরেছে? তখন বোমা হামলা হলেই বলতো, এসবের পিছনে মৌলবাদীরা দায়ী নয়তো অন্তর্কোন্দল। কিন্তু কারা সেই মৌলবাদী, কি তাদের উদ্দেশ্য, কোথা থেকে তাদের অর্থ আসে, এদের কি করে দমন করতে হবে, এসব ব্যাপারে জানতে গিয়ে বা জনগণকে জানাতে গিয়ে এই মৌলবাদীদের গোড়াসুদ্ধ টান দিতে কি পেরেছে আওয়ামীলীগ সরকার? সাহসই তো করে নাই। জনগণকে জানানোতো অনেক দূরের কথা। বরং বলা যায় ঐ সময়ে এই সকল বোমাহামলা নিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে কোন কুন্ঠা বোধ করে নি। একবার শুধু দেখা গেল কোটালীপাড়ায় শেখ হাসিনার জনসভায় বোমা পোতে রাখার অভিযোগে 'মুফতি হান্নান' নামে একজনকে গ্রেফতার করার জন্য পুরষ্কার ঘোষনা করা হল। এই মুফতি হান্নান আবার গ্রেফতার হলেন বর্তমান চার দলীয় জোট সরকারের আমলে। মৌলবাদীদের উত্থান, বোমা হামলার রহস্য উদঘাটনে আওয়ামীলীগ সরকারের ব্যর্থতা সম্পর্কে আওয়ামীবুদ্ধীজীবিরা এতো নিশ্চুপ কেন? আবার বি এন পি পন্থী বুদ্ধীজীবিরা শায়খ আবদুর রহমানের জেএমবি বা জামাতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ, সিদ্দিকুর রহমানের ('বাংলা ভাই' শব্দটি ব্যবহার করতে আমার ব্যক্তিগত আপত্তি আছে। এই শব্দ ব্যবহার করে বাংলা ভাষাকে অপমান করতে চাই না।) জাগ্রত মুসলিম জনতা'র উত্থান সম্পর্কে নিশ্চুপ। উনারা কিছুতেই স্বীকার'ই করতে চান না এদের উত্থান চার দলীয় জোটের আশ্রয়-প্রশ্রয়ে হয়েছে? বরং বিরোধী দলের এক নেতার সংগে জামাতুল মুজাহিদিন নামের জংগীদলটির নেতৃত্বের আত্মীয়তার সম্পর্ক আবিষ্কার করে চলছেন। উনারা স্বীকার না করলে কি হবে, আমরা পত্রিকান্তরে জানি, ভুমি উপমন্ত্রী রুহুল কুদ্দুস তালুকদারের ভাতিজা গামা সন্ত্রাসী হামলায় নিহত হলে পূর্ববাংলা কমিউনিষ্ট পার্টি সহ অতি বাম চরমপন্থী দলগুলোর উপর প্রতিশোধ নেবার জন্য সিদিক্কুর রহমানকে দিয়ে 'জাগ্রত মুসলিম জনতা' নামে জংগী দলটি গঠন করা হয়। এই সকল সহজ সত্য কথা বলতে আমাদের তথাকথিত বুদ্ধীজীবিদের বিবেকে এতো বাধে কেন? বিবেক বন্ধক রেখে লিখতে গেলে যে সুযোগ সুবিধামতো চেপে চেপে লিখতে হয়। **ভন্ডামীর খেমটা নাচ উনারা বেশ ভালোই দেখাতে পারেন।** ইসলামী মৌলবাদের উত্থান নিয়ে

আলোচনা করতে হলে, সহজ কথায় বলতে হয় বাংলাদেশে সেক্যুলার রাজনীতি ব্যর্থ। কারণ কি? এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন সৈয়দ আবুল মকসুদ (*দৈনিক প্রথম আলো- ৩ জানুয়ারী,২০০৬।*) **'অন্ধকারাচ্ছন্ন অপরাজনীতির বিরুদ্ধে আলোকিত রাজনীতির বিস্তার ঘটুক'** শীর্ষক লেখায়। লেখক খুব সংক্ষিপ্ত কথায় বলেছেন, **'জনগণের বিরাট অংশের প্রতিক্রিয়াশীল মানসিকতা থেকেই এ সমাজে প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতির সূত্রপাত'**। এই একটি বাক্য দিয়েই লেখার অনেকখানি ভাব প্রকাশ পেয়ে গেছে। এছাড়াও লেখক বিভিন্ন সময়ের ঘটিত ঘটনা, বর্তমান মৌলবাদীদের পূর্বসূরিদের ইতিহাস, ইতিবৃত্ত বর্ণনা করার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছেন, আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের ভিতর সদা জাগ্রত প্রতিক্রিয়াশীল মানসিকতা। সুদীর্ঘ সময়ধরে আমাদের সমাজে রক্ষনশীলতাকে (সাম্প্রদায়িকতা, প্রতিক্রিয়াশীলতা; যে নামেই অভিহিত করা হোক না কেন?) লালন-পালন করা হয়েছে, প্রশ্রয় দেয়া হয়েছে নানা ভাবে। শ্রদ্ধেয় লেখক সৈয়দ আবুল মকসুদ উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরেছেন 'রেললাইনের প্রচলনের সময় ধর্মান্ধগোষ্ঠীর বাধাপ্রধান', 'টিউবওয়েল ব্যবহার করতে নিষেধ; কারণ টিউবওয়েলের ভিতরে চাকতি সদৃশ বস্তুটির শরীর শুকর না গরুর চামড়া দিয়ে তৈরি তা নিয়ে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের দ্বিধাদ্বন্ধ', 'মসজিদে আজান দেয়ার জন্য মাইক ব্যবহার করা (ইবলিশের আওয়াজ!) নিয়ে কতই না রক্তারক্তি-হাতাহাতি', 'আন্ডারওয়ার পড়তে নিষেধ, কারণ এতে পুরুস্তহানি ঘটতে পারে (!) ইত্যাদি উদ্ভট কতগুলো ঘটনা।' পরিবর্তন আমরা অনেকেই সহ্য করতে পারি না। পরিবর্তন দেখলেই আমরা রে রে করে উঠি। বস্তাপচা বিশ্বাস, প্রথা আকড়ে ধরে শান্তি পাই, এর স্বপক্ষে যুক্তি (!) খুঁজি। অধুনা আমাদের দেশে এনজিও'দের কার্যক্রম নিয়ে কতই না তুমুলকালাম কান্ড ঘটে চলছে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, এই এনজিও'দের কার্যক্রম বন্ধ করার জন্য শুধু মৌলবাদীরাই আন্দোলন করে নি, বামপন্থীরাও (যারা নিজেদের কথায় কথায় প্রগতিশীল বলে আত্মতৃপ্তি বোধ করেন!) এদের সাথে যোগ দিয়ে বক্তৃতা-বিবৃতি, লম্ফবাজি করেছেন, আজ কতিপয় বামপন্থীকে চিনি যারা এনজিও খুলে নিজেদের পেট চালাচ্ছেন!! সেলুকাস! দেশের অনেক বুদ্ধিজীবিরা প্রায়ই উদাহরন হিসেবে বলে থাকেন, এই দেশে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে সকল মৌলবাদী রাজনীতির মৃত্যু ঘটেছে। মোটেও না। বলা যায়, মৌলবাদী রাজনীতি কিছুকাল নিশ্চুপ হয়েছিল কিন্তু নিশ্চিহ্ন হয়নি। তাইতো কিছু কাল চুপ করে থাকার পর, সময়-সুযোগমতো সুকৌশলে প্রতিক্রিয়াশীল মানসিকতার বিকাশ লাভের মাধ্যমে মৌলবাদী রাজনীতির ধারা পুষ্ট হয়েছে। আজ যা মহীরুহ আকার ধারণ করেছে। এই প্রতিক্রিয়াশীল মানসিকতার বিকাশের মূল কারণগুলি হচ্ছে আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃত্বের অযোগ্যতা, সর্বগ্রাসী লোভ, দুর্নীতি, যেনতেন উপায়ে ক্ষমতা চিরস্থায়ী করার চেষ্টা, মৌলবাদী দল সম্পর্কে উদাসীন্য, সময়ে সময়ে প্রশ্রয়দান, নীতি নৈতিকতা বিবর্জিত বুদ্ধিজীবিদের ভন্ডামো, দ্বীচারিতা, চরিত্রস্খলন, শিক্ষাব্যবস্থার দুর্বলতা সহ আন্তর্জাতিক উপাদানসমূহ (মধ্যপ্রাচ্যের পেট্রোডলারের প্রাদুর্ভাব, পশ্চিমাদেশ সমুহের ভ্রান্ত পররাষ্ট্রনীতিসহ প্রতিবেশী দেশের বড়ভাইসুলভ আচরন) জড়িত। হয়তো আরো অনেক পারিপার্শ্বিক কারণ জড়িত, তবে মোটাদাগে উপরিউল্লেখিত কারণগুলির কথা বলা যায়।

এ দেশে আত্মঘাতী বোমা হামলা হওয়ার পর চারিদিকে বেশ কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বুদ্ধিজীবিদের আনাগোনা বেড়ে গেছে মঞ্চে। আগে ইসলাম নিয়ে তেমন একটা আলোচনা হতো না, মৌলবাদ নিয়েই আলাদা ভাবে আলোচনা হত। এখন ইসলাম নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। ভালো লক্ষণ। কিন্তু মাদরাসা ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যত নিয়ে কি কোন গঠনমূলক আলোচনা হচ্ছে? আমাদের কোন সরকার-প্রশাসন, এঁদের তাবেদার মিডিয়াগোষ্ঠী, বুদ্ধিফেরিওয়ালারা কি কখনো ভেবে দেখেছেন, মাদরাসায় অধ্যয়নরতরা কি শিখছে, কারা পড়তেছে এখানে, তাদের পাঠ্যপুস্তকে কি আছে? এই মাদরাসা থেকে বের হয়ে এতো অগনিত শিক্ষানবীশরা কোথায় যায়? এই দেশে এদের ইমামতি ছাড়া আর কি কোন বৃহৎ পরিসরে কর্মসংস্থানের সুযোগ আছে? না, এই সকল প্রশ্ন নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করার বা বলার মতো সময় যে এই দেশের অধীশ্বর বা উনাদের চামচা ফেরসতাদের নাই। কোন সরকার কি মাদরাসা থেকে বের হয়ে যাওয়া ছাত্রছাত্রীদের জাতীয় উৎপাদনের পথে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করেছেন? কিংবা কোন সরকার কি মাদরাসা ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস, নবান্ন মেলা, পহেলা বৈশাখের বর্ষ বরণ অনুষ্ঠানে সম্পৃক্ত করেছেন বা নূন্যতম কোনো উদ্যোগ নিয়েছেন? অনেক স্কুল কলেজেইতো সরকারি অনুদানে জাতীয় অনুষ্ঠানগুলো পালিত হয়ে থাকে, তবে এদের প্রতি কেন বিমাতাসুলভ আচরন করা হয়েছে। স্বাধীনতার পর থেকেইতো বাংলাদেশে আমরা মাদরাসা ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যত নিজামী, সাইদি, চারমোনাই, দেওয়ানবাগী, ফুলতলী নামধারী রাজাকার-আলবদরদের হাতে তুলে নিরাপদে নিশ্চিন্তে বসে আছি। এই দেশের মধ্যে যুগ যুগ ধরে বৈষম্য সৃষ্টি করে তীব্র ক্ষোভের উপাদান যুগিয়ে চলছি, আবার আজ এরা তীব্র ক্ষোভ বুকে নিয়ে ইসলামী হুকমত কায়েম জন্য আত্মঘাতী হলে আমরা রে রে করে উঠছি। হাহ! 'আজকের আধুনিক যুগে মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থা অচল'- জেনেও ছাপোষা বুদ্ধিজীবির দল কি কখনও এই শিক্ষাব্যবস্থার আধুনিকরন পরিবর্তন অথবা বাতিলের দাবি জানিয়েছেন? বরং বিচ্ছিন্নভাবে এই বক্তব্য কখনো উদিত হলে তাঁরা সেই কন্ঠস্বর রুদ্ধ করেছেন তথাকথিত উপাসনাধর্মীয় আবেগের দোহাই দিয়ে। অথচ নিজেদের বংশধরদের লেখাপড়া করাচ্ছেন তথাকথিত আধুনিক মার্কামারা বাংলা-ইংলিশ মিডিয়াম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে। বড় অদ্ভুত উনাদের কাজকারবার! তবে আশার কথা, আমাদের দেশের অধিষ্ঠিত (!) বুদ্ধিজীবিরা যা বলতে পারেন নি, গণমাধ্যমের নতুন উপকরন 'অন্তর্জাল'-এর সুপরিচিত লেখক নন্দিনী হোসেন (সাতরং অন্তর্জালের প্রতিষ্ঠাতা) বর্তমানে মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থার অকার্যকরিতার জন্য এই শিক্ষাব্যবস্থা বাতিলের জোড় দাবি জানিয়েছেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে শ্রদ্ধেয় নন্দিনী হোসেনের সাথে একমত। এই দাবি আমাদের সব জায়গায় ছড়িয়ে দিতে হবে। জানি, এই বক্তব্যের বিরুদ্ধাচরণ করার লোকের অভাব হবে না। আবেগপ্রবণ বক্তব্যেরও ঘাটতি হবে না। উপরতলার অধিবাসী থেকে শুরু করে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষিত শিক্ষক, সাংবাদিক, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, আমলাসহ সব্বাই এর বিরোধিতা করবেন। এবং আমাদেরকেও এদের মোকাবেলা করতে হবে। এই দেশকে বাঁচাতে হলে 'মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থা বাতিলের দাবি'কে গণমানুষের মধ্যে বিতর্কের ইস্যু হিসেবে তুলে ধরতে হবে। আমরা এই নিয়ে যুক্তিপূর্ণ আলোচনা চাই। সেই সাথে মনে করি, অন্যদুটি শিক্ষাব্যবস্থা (বাংলা মাধ্যম ও ইংরেজী মাধ্যমের শিক্ষাব্যবস্থা) নিয়ে সৃষ্ট সমস্যার সমাধান দরকার। বাংলা মাধ্যমের শিক্ষাব্যবস্থার আধুনিকীকরণ দরকার। শিক্ষক নিয়োগ থেকে শুরু করে, শিক্ষানীতিপ্রনয়ণসহ সব জায়গায় অব্যবস্থাপনার কারণে যে জোড়াতালি

আর গোঁজামিল দিয়ে চলছে, এর আমূল পরিবর্তন করতে হবে। এবং মাদরাসা থেকে বের হয়ে যাওয়া অথবা অধ্যয়নরত অগনীত ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যাপারেও ভেবে দেখতে হবে। এরা এদেশেরই সন্তান। উপযুক্ত কর্মসংস্থানের কথা মাথায় রেখে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

(৪)

সময়ই বলে দেয় আমাদের কখন কি করতে হবে। সময় হয়েছে এখন, সব উপাসনাধর্ম নিয়েই খোলাখোলি আলোচনা হওয়া দরকার। উপাসনাধর্ম নিয়ে খোলাখোলি আলোচনা করার কথা, কিংবা এগুলির সংস্কার বা পরিবর্তন নিয়ে কেউ কথা বললে, কতিপয় ভাববাদী (উনারা নিজেদের সমাজতন্ত্রী ভেবে পুলকিত বোধ করেন) অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বলে উঠেন, '*ঐতিহাসিক প্রয়োজনে উপাসনাধর্মের উৎপত্তি, ঐতিহাসিক প্রয়োজনে এর বিলুপ্তি ঘটবে। কোনো পরিবর্তন কিংবা সংস্কারের প্রয়োজন নেই।*' হাহ! উপাসনাধর্ম মনে হয় আকাশ থেকে টুপ করে পড়েছে, আবার সময় হলে টুপ করে আকাশে উঠে যাবে! যে উপাসনাধর্মগুলি সুদীর্ঘ পচিশ হাজার বছর ধরে ধীরে ধীরে আমাদের সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাষ্ট্রের হাড় মাংস অস্থিমজ্জায় ঢুকে গেছে, আমজনতার প্রাত্যহিক চিন্তাচেতনায় যার প্রাদুর্ভাব লক্ষ্য করা যায় তা সময় হলেই আপনা আপনিই বিদায় নিবে, কোন প্রচেষ্টার প্রয়োজন হবে না, এই বক্তব্য কোন শিশুকে বুঝিয়ে বললে সেও বিশ্বাস করবে কি না, তা নিয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে!! যাই হোক, আমরা মনে করি বিজ্ঞানের এই অগ্রগতির যুগে তথাকথিত কোন উপাসনাধর্মকেই আধ্যাত্মিকতার জগৎ বলে রহস্যাবৃত করে রাখার সময় শেষ। যে উপাসনাধর্মগুলি সুদীর্ঘ সময় ধরে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে আমাদের মানবিকতাবোধকে, তাকে পোষ্টমর্টেম করতে হবে। প্রকাশ্যে নিয়ে আসতে হবে 'শান্তিবাদী' 'মানবতাবাদী' নামক সুন্দর সুন্দর শব্দের আড়ালে থাকা এদের কুৎসিতরূপকে। একটা উপাসনা ধর্মের জঙ্গীপনার উথ্বানে ভেবেছিলাম, এইবার হয়তো আমাদের বুদ্ধিজীবিদের চেতনা ফিরবে, সাহস করে সব উপাসনাধর্মের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখবেন, যুক্তি দিয়ে, তথ্য দিয়ে আমজনতাকে উপাসনাধর্মের আফিম থেকে মুক্ত করার প্রচেষ্টা নিবেন কিন্তু আমাদের সেই আশায় গুড়োবালি। 'শান্তিবাদী' 'প্রগতিবাদী' আখ্যা দিয়ে উপাসনাধর্ম নামক পপি গাছকে জিইয়ে রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন আমাদের বুদ্ধিজীবিরা। এর জন্য সত্য গোপন করতে বিন্দুমাত্র কুন্ঠাবোধ করছেন না। একটা উদাহরন দিচ্ছি। '**২ই ডিসেম্বর ২০০৫**' তারিখের সংখ্যায় একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা 'আত্মঘাতী বোমা হামলা'র প্রেক্ষিতে একটি প্রচ্ছদ কাহিনী ছাপে। শিরোনাম রাখা হয় '**ধর্মের নামে মানুষ হত্যা, ইসলাম কী বলে**'। প্রচ্ছেদে যে ছবি ব্যবহার করা হয় তাতে দেখা যাচ্ছে, হাদিসের উপর ম্যাগনেফায়িং গ্লাস দিয়ে একটি হাদিস দেখানো হচ্ছে। প্রচ্ছদে যে হাদিসটি লেখা রয়েছে, তা হলো- '***যে মুসলমান অন্য মুসলমানকে হত্যা করলো সে কাফের- আল হাদীস***'। এর প্রেক্ষিতে লেখক ফরহাদ মাজহার (কারও কারও কাছে বিতর্কিত) **দৈনিক প্রথম আলোতে** (*৮ই ডিসেম্বর ২০০৫*) একটি উপসম্পাদকীয় লেখেন। শিরোনাম হচ্ছে '***বোমা সমাজে প্রতিক্রিয়ার পুটলিগুলো ফাঁস করে দিচ্ছে***'। সেখানে লেখক প্রচ্ছদে ছাপানো হাদিসের একটি ভুল ধরে দিয়েছেন। আমার কাছে এই মুহুর্তে ৮ই ডিসেম্বরের দৈনিক প্রথম আলো'র কপিটি না থাকায় লেখকের বক্তব্য হুবুহু তুলে ধরতে পারছি না। আগ্রহীরা প্রথম আলো'র অন্তর্জাল

সংস্ককরন থেকে পড়ে নিতে পারেন। তবে মোটামুটি লেখকের বক্তব্য হচ্ছে এই রকম, তিনি হাদিস বিশেজ্ঞ, ফিকাহ্ বিশেজ্ঞদের সাথে আলাপ করে জেনেছেন, ঐ সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রচ্ছদে ব্যবহৃত হাদিসটির পূর্ণরূপ হচ্ছে, '*যে মুসলমান অন্য মুসলমানকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে সে কাফের* '। এখন লেখক ফরহাদ মাজহারের বক্তব্য যদি সঠিক হয়, তাহলে প্রশ্ন আসে, এই সাপ্তাহিক পত্রিকার হাদিসের অর্থবিকৃতির কারণ কি? এঁরা কি না জেনে কি সত্য গোপন করেছেন? আমার মনে হয়, উনারা ইচ্ছাকৃতভাবে এটি করেছেন। পাঠকবৃন্দ, আপনাদের কি মনে হয়? হয়তো অনেকে প্রশ্ন তুলবেন, 'অন্যায়ভাবে' শব্দটি নিয়ে এতো টানা হেঁচড়া কেন করছি? 'ন্যায়-অন্যায়' শব্দগুলো আপেক্ষিক। একেক জন একেক ভাবে অনুধাবন করতে পারেন। স্থান, কাল, পাত্র ভেদে পরিবর্তিত হয়। এখন, যারা ইসলাম উপাসনাধর্ম দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আত্মঘাতী হতে চায়, তারা যদি মনে করেন রাষ্ট্রযন্ত্র তাদের প্রতি অন্যায় আচরণ করছে, রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদানে বৈষম্যমূলক আচরন করছে, ইসলামী হুকমত কায়েমের জন্যে রাষ্ট্রযন্ত্র বাধা, তাহলে সে আত্মঘাতী হলে উপরোক্ত হাদিসের আলোকে **'কাফের'** হিসেবে চিহ্নিত হবেন না। হয়তো ইসলামে জিহাদ করা কিংবা অত্যাচারী শাষকগোষ্ঠীকে দমন করে ইসলামী হুকমত কায়েমের নানা শর্ত রয়েছে। এ ব্যাপারে আমার বিশেষ জ্ঞান না থাকার কারণে বিস্তারিত লিখছি না। তবে মনে প্রশ্ন আসছে, লেখক ফরহাদ মাজহার সত্য গোপন করার একটি নমুনা দেখিয়েছেন বলে আমরা একে ধরতে পারছি। কিন্তু ভিতরে ভিতরে এই সকল ভন্ড সেক্যুলারলিস্টরা কত অর্থবিকৃতি, সত্য গোপন করে চলছেন তার হিসেব কে নিবে? আবার আরেকটি প্রশ্ন করি, ম্যাগেনেফায়িং গ্লাস দিয়ে সাধারণত খুব ছোট জিনিষ বড় করে দেখা হয়, এখন ঐ সাপ্তাহিক পত্রিকা ম্যাগনেফায়িং গ্লাস দিয়ে ভালো (?) হাদিস দেখিয়েছেন। হাদিসে কি ভালো ভালো কথা, শান্তির কথা, মানবপ্রেম নিয়ে খুব কমই বলা আছে, যে এগুলিকে খুঁজে বের করতে ম্যাগনেফায়িং গ্লাসের প্রয়োজন হয়েছে!?! হয়তো কেউ উত্তরে বলবেন, জঙ্গীদের দেখানোর জন্য এটা করা হয়েছে, এঁরা অন্ধভাবে সিদ্দিকুর রহমান, আবদুর রহমানের ভ্রান্ত কথায় বিশ্বাস করছে। তাহলে আবার প্রশ্ন আসে বাক্যের বিকৃতি ঘটিয়ে ম্যাগনেফায়িং গ্লাসের দিয়ে দেখানোর প্রয়োজন কি? আবদুর রহমান, সিদ্দিকুর রহমান কিংবা তাঁদের মতাদর্শের লোকেরা কি তাহলে বলবে না, '*আমাদেরই পথই ঠিক, আমরাই একমাত্র ইসলাম ভালো বুঝি ; এরা ইসলাম বুঝেন না, শব্দ গোপন করে হাদিস প্রচার করেন* '। এক্ষেত্রে মিথ্যা বলে কি লাভ আছে? উনারা সত্য কথা সোজা ভাবে বলতে এতো আটকে যান কেন? এই ধরনের বিকৃতি ঘটিয়ে কি সেক্যুলারিস্টদের চরিত্র আরেকবার উন্মোচিত হলোনা?

বাংলাদেশের বাস্তব অবস্থা নিয়ে ভাবতে ভালো লাগে না। বরং কষ্ট হয়। তবে সত্যি কথা হচ্ছে এই দেশ নিয়ে স্বপ্ন দেখতে ভালো লাগে। কিন্তু সেই স্বপ্নগুলোকে কে বাস্তবে রূপ দিবে, কে?

হে ধর্মরাজ, ধর্মবিকার নাশি
ধর্মমূঢ়জনরে বাঁচাও আসি।
যে পূজার বেদি রক্তে গিয়েছে ভেসে
ভাঙো ভাঙো, আজি ভাঙো তারে নিঃশেষে-

ধর্মকারার প্রাচীরে বজ্র হানো,
এ অভাগা দেশে জ্ঞানের আলোক আনো।
—— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (রচনাকাল- ১৯২৬)